শিশু-চরিত্রে শরৎচন্দ্র

নির্ম্মল ভট্টাচার্য্য

২য় বর্ষ, সাহিত্য।

শরৎচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। মনুষ্যের সঙ্গে জীবনের সঙ্গে, আমাদের নূতন করে পরিচয় ঘটাইয়াছেন। বাস্তব ও আদর্শের মধ্যে মিল রাখিয়া যে উপন্যাস রচিত হয়. যে উপন্যাসে মানব মনের নিগূঢ় তত্ত্ব, ছোট-খাট সুখ দুঃখ, আনন্দ বেদনা, আশা নিরাশা একই সঙ্গে ছায়া চিত্রের মত পাঠকের চোখে ফুটাইয়া তোলে, তাহা কোন শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পির রেখাঙ্কনের চেয়ে ছোট-নয়। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের প্রত্যেকটী নায়ক নায়িকা সজীব ও প্রাণবন্ত। দুঃখ-দৈন্য নিপীড়িত জীবনের পথে পথে এদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় সত্য ও নিত্য। মানুষের আকৃতি ও প্রকৃতি লইয়া তাহারা আমাদের সম্মুখে চলিয়া ফিরিয়া বেড়ায়; সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনার ঘাত প্রতিঘাতে তাহারা মানবীয় মূর্ত্তিতে উজ্জ্বল ও সজিব হইয়া উঠে। তাই তার প্রত্যেকটি চরিত্র তাদের সমস্ত সুখদুঃখ, পাপ-পুণ্য, ন্যায় অন্যায় নিয়ে তাঁর সমতার স্নেহস্পর্শে যেমন অপরূপ হয়ে দেখা দেয়, তেমনটি আর দেখা যায় না। দরদী শরৎচন্দ্রের দরদ যে কেবল তাঁর বড় বড় চরিত্রগুলির উপরেই তা নয়—তিনি কেবল পরিণত মনের চিন্তাধারা লইয়াই ব্যাপৃত থাকেন নাই। শিশুমনের যে ভাবধারা নব নব বিস্ময় ও কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া বহিয়া চলে সে দিকটাও তিনি সমান দক্ষতা ও সমতার সঙ্গেই আঁকিয়াছেন।

"মেজদিদির শরৎ সাহিত্যের এমনি এক সম্পদ;—সৃষ্টি হিসাবে অভিনব, অনবদ্য সুন্দর। চৌদ্দ বছরের পিতৃমাতৃহীন বালকের লাঞ্ছিত, উৎপীড়িত জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ করুণ কাহিনী। মেজদির "কষ্ট", সর্ব্ব সুখ বঞ্চিত দরিদ্র এক বালক, মুখতুলে না পারে কথা কইতে, না পারে প্রতিবাদ করতে। এই type এর আরও গুটিকতক চরিত্র আছে, যেমন—কাঙালী, পরেশ. গদাধর ইত্যাদি। এরা চিরদুঃখী। তাই স্নেহের কাঙ্গাল। যথার্থ স্নেহ যত্ন যে করে তাকে এরা চিন্তে পারে অতি সহজেই। সে চেনা এত নিবিড়, তার প্রতি ভালবাসা তাদের এত গভীর যে তার স্নেহলাভের জন্য, তাকে খুসী কর্‌বার জন্য সব কিছু নির্য্যাতনই তারা মাথা পেতে নেয়।

আর এক type এর চরিত্র আছে, তারা ঠিক এগুলির একেবারে উলটো। তারা অতি দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির, গোঁয়ার ও একরোখা। কিন্তু যদি সত্যিকারের ভালবাসা তারা পায়

তাহলে অতি সহজেই বশ্যতা স্বীকার করে। "রামের সুমতির" 'রাম' ও "মামলার ফলের" "গয়ারাম" এই typeএর। এরা অভিমান করে, আবদার জানায়, নিজের খুসীমত কাজ না পেলে তাদের স্নেহদাতৃকেই আঁচড়ে কামড়ে একাকার করে। এ ছাড়া আরও অনেক ছোটখাট চরিত্র আছে, যেমন ছেলেবেলার দেবদাস ও শ্রীকান্ত, যতীনদা, অতুল, বিপিন, অমূল্য, নরেন, কানাই, হরিচরণ প্রভৃতি।

তারপর কেষ্টর কথা থেকেই সুরু করা যাক্। চিরদুঃখী, নিরীহ ও লাজুক কেষ্ট মেজদির স্নেহের ও যত্নের প্রকৃত আস্বাদ পেয়ে, ধীরে ধীরে তাঁকেই মাতৃরূপে পূজা করতে আরম্ভ করে। তাই সময় পেলেই সে মেজদির কাছে ছুটে যেতে চায়। সে লাজুক কথা বলে কম, তাই প্রথম যে দিন মেজদির অসুখ শুনে তাঁকে দেখতে এসেছিল তখন মলিন কোঁচার খুঁট খুলে দুটি আধপাকা পেয়ারা বার করে কেবলমাত্র বলেছিল, "জ্বরের ওপর খেতে বেশ।" কিন্তু এই কথা কটিই যথেষ্ট। এইটুকুতেই মেজদির প্রতি স্বল্পভাষী বালকের কী গভীর ভালবাসা প্রকাশ পেয়েছে তা বুঝতে একটুও দেরী হয় না। মেজদির অসুখে, পূজা দিতে যাবার জন্য তার সেই উৎসাহ ও অস্থিরতা। গয়লাদের কাছে আদায় করা টাকা তিনটে নিয়ে সে মেজদির জন্য পূজো দিয়ে এলো। কিন্তু এত সাহস তার এলো কোথা হতে? অমন দুর্দ্দান্ত দিদির শাসনপাশও সে অগ্রাহ্য করে বল্লে—"মারুক্‌গে তোমার অসুখ সেরে যাবে তো?" এই কথা কয়টিতে কেষ্টর অন্তরের স্নেহ-ব্যাকুল ছবিটি খুব স্পষ্ট হয়েই পাঠকের চক্ষুর উপর ফুটে উঠে। তার পীড়িত বালক হৃদয় মাতৃসমা মেজদিকে হারাবার ভয়েই সে সব কিছু শাসনের বেড়া অতিক্রম করতে একটুও দ্বিধা করেনি তা স্পষ্টই বোঝা যায়।

অভাগীর ছেলে কাঙালী—তার ছোট জীবনের সকরুণ পরিচ্ছদটুকুও লেখক ছোট করেই এঁকেছেন! কিন্তু এই কাহিনীটুকুই কী ব্যাখ্যাময় ও মর্ম্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। কাঙ্গালীর সঙ্গে কেষ্টর অনেকটা সাদৃশ্য আছে। দু'জনেই নিরীহ, লাজুক, ও মুখচোরা তবে কাঙ্গালী একটু বেশী Forward। কাঙ্গালী চরিত্রে লেখক শিশুমনের এক নিগূঢ় অভিমানের অভিনব প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন।

"রামের সুমতীর "রাম" ও "মামলার ফলের" "গয়ারাম" উভয়েই এক typeএর। দু'জনেই গোঁয়ার, রাগলে কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। কিন্তু দুজনেরই উদ্ধত মস্তক নিচু হয়ে আসে তাঁদের কাছে, যাঁরা তাদের অন্তরের সঙ্গে স্নেহ করেন। কিন্তু এদের মধ্যে পার্থক্যও আছে অনেক। গয়ারামের চেয়ে রামের বয়স কম, সে অবুঝ শিশুমনের প্রভাব থেকে সে মুক্ত নয়। সে বৌদিকে ভালবাসে ভক্তি করে, লজ্জা পেলে বৌদির বুকে মুখ লুকোয়। এই বৌদির অসুখে সে স্থির থাকতে পারে না, ডাক্তারকে জানায়। তার যত অত্যাচার

অধিকাংশই বৌদির ওপর। রাম জানে এক বৌদিই তাকে ভালবাসে, তাই এই বৌদি ছাড়া কাউকেই সে গ্রাহ্য করে না। বৌদির ওপর তার ভালবাসাও যেমন, নির্ভরতাও তেমনি অন্ত নাই। অজান্তে বৌদিকে আঘাত করে তার মনটা যে ভেতরে ভেতরে কতখানি কেঁদেছিল তা তার কাঁচা পেয়ারা বার বার কপালে ঠুকে তার আঘাতের গুরুত্ব উপলব্ধি করবার চেষ্টা থেকেই বোঝা যায়। শিশু হৃদয়ের এই সুগভীর ব্যথার কথা আর কোন রকমেই কি এমন করে প্রকাশ করা যেত?

এদিকে গয়ারামের যত উপদ্রব সব তার জেঠাইমার ওপর। জেঠাইমাকে সে ভালবাসে, তাঁর কাছে আবদার করে, জ্বালাতন করে। সময়ে অসময়ে সে তাঁর ওপর জুলুম করে, গাল দেয়। জেঠাইমা যদি বলে খেতে দিতে পারবো না, তার উত্তরে সে তৎক্ষণাৎ বলে—"তুই দিবি না তো কে দেবে?" ফটকে দেবার ভয় দেখালে সে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বলে—"ইঃ তুই আমাকে ফটকে দিবি……আপনিই কেঁদে কেঁদে মরে যাবি, আমার কি হবে।" জেঠাইমার দুর্ব্বলতা যে কোথায় সেটা সে বুঝতে পেরেছিল জেঠাইমার প্রতি তার অন্তরের সুগভীর ভালবাসার মধ্য দিয়া।

এই তো গেল বড় বড় চরিত্রগুলির কথা। কিন্তু যে সব ছোট খাট চরিত্রগুলি বড়দের ফাঁকে ফাঁকে নানাভাবে জড়িয়ে আছে সেগুলিও তাদের মাধুর্য্য, তাদের শিশুসুলভ অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে অভিনব, অনবদ্য সুন্দর। 'দত্তার' পরেশ একদিকে যেমন পাঠকে হাঁসির খোরাক যোগায় আবার তেমনিই তার ম্লান মুখচ্ছবি ও ভয়ে-ভরা। অস্ফুটকণ্ঠে—"এর বেশী যে দেয়না মাঠান," তার প্রতি মমতায় মন ভরে ওঠে। দেবদাসের যুবক জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতা ও তাহার পরিণাম যেমন পাঠকের চিত্তকে অশ্রুভারাক্রান্ত করে তোলে, তেমনি তার শৈশবের সেই বাঁশঝাড়ের মধ্যে বসে গম্ভীরভাবে হুঁকোটানা, পার্ব্বতীকে সময়ে অসময়ে প্রহার করা, এমনি কত ছোটখাট তুচ্ছ ঘটনা পাঠকের চিত্তকে আনন্দরসে আপ্লুত করে। তারপর আরও যে চরিত্রগুলি আমাদের মনের মাঝে উঁকিঝুঁকি মারে সেগুলিও জীবন্ত। এদের কথাবার্ত্তা, এদের চালচলন, এদের শিশুসুলভ ভঙ্গিমা আমাদের তৃপ্তি দেয়, আনন্দ দেয়, আমাদের ভুলিয়ে দেয় যে তারা কাগজের ওপর সামান্য কালির দু'একটা রেখা মাত্র। তারা মানবীর মূর্ত্তিতে আমাদের চোখের ওপর আনাগনা করে, if you hurt them and they will bleed.

পরিশেষে আর এক কথা। "মেজদি" ও "রামের সুমতী" দু'খানা দুদিক দিয়ে সম্পূর্ণ। রাম চরিত্রের সবটুকু মাধুর্য্যের মধ্যে শুধু রামের কীর্তিই বড় নয়, নারায়ণীর মাতৃহৃদয়ের অফুরন্ত অমৃতধারার আলোকচ্ছটা যেন ক্ষুদ্র রামকে অধিকতর শ্রীমণ্ডিত করে তুলেছে। কিন্তু

মেজদির কেষ্ট আসে ধীরে, নিঃশব্দে, স্তব্ধ রজনীর শান্ত গম্ভীর মূর্ত্তির মত ; দয়া নাই, মায়া নাই, স্নেহ নাই, প্রীতি নাই এমনিই এক পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনে সে এসে পড়ে। অসীম অত্যাচার লাঞ্ছনার মধ্যে আপনারিই ব্যক্তিত্বে ক্রমে ক্রমে মাতৃরূপা অমূর্ত্তময়ী মেজদির অন্তরে স্থান করে নেয়। সর্ব্বক্ষণ তারই প্রতি সে আমাদের মুগ্ধ দৃষ্টিকে সচেতন করে রাখে।

সাহিত্য-সংসদ

পঞ্চম বর্ষের প্রথম অধিবেশন।

গত ২৮শে শ্রাবণ শনিবার সন্ধ্যা ৮টায় ৩৫ নং স্কটলেনস্থ ক্যানিং হোষ্টেলের "সাহিত্য সংসদে"র পঞ্চম বর্ষের প্রথম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মণিভূষণ ভট্টাচার্য্য এম্, এ মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভার প্রথমে বিদায়ী সভাপতি শ্রীযুক্ত ধ্রুবদাস ভট্টাচার্য্য ও বিদায়ী সম্পাদক শ্রীযুক্ত গৌরদাস মুখোপাধ্যায় সংসদের বিগত বর্ষের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তৎপর সুকবি শ্রীযুক্ত গোপাল ভৌমিক বি-এ 'সাহিত্য-সংসদে' উদ্দেশ্য এবং ইহার বিগত কার্য্যাবলী সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। পরিশেষে সভাপতি মহাশয় একটি নাতিদীর্ঘ সুন্দর অভিভাষণ প্রদান করেন।

তৎপর বর্ত্তমান বৎসরের জন্য সাহিত্য-সংসদের নিম্নলিখিত কার্য্যানির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হয় :

পৃষ্ঠপোষক : অধ্যাপক মনিভূষণ ভট্টাচার্য্য ও অধ্যাপক সুখেন্দ্র কুমার রায়। সভাপতি : শ্রীযুক্ত গোপাল ভৌমিক বি-এ। সহ-সভাপতি : জ্ঞানেন্দ্র মৈত্র সম্পাদক : দেবব্রত রেজ সহ-সম্পাদক : অনিলবরণ গাঙ্গুলী, সত্যরঞ্জন দাস, মনতোষ সরকার, ভবেশ চন্দ্র রায়। নির্ব্বাচন শেষে রাত্রি নয়টার সময় সভাভঙ্গ হয়।